**BDSF এর ১৮তম পাবলিক লেকচারে উপস্থাপিত: মে দিবস ও মানবিক দুনিয়ার সংগ্রাম**

**জুয়েল রানা, সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি**

মহান মে দিবসের পটভুমিঃ

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রম শোষণ সকল সময়েই বিদ্যমান। শিল্প বিপ্লবের ফলে শ্রমিকের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের ঘটনা বেড়ে যায়।শ্রমিকদের কারখানার অসাস্থ্যকর ও অনিরাপদ পরিবেশে ১০-১৬ ঘন্টা কাজ করতে হতো। যেখানে ক্ষত, পঙ্গু ও মৃত্যু ছিল খুবই স্বাভাবিক যার লোমহর্ষক বর্ণনা পাওয়া যায় উপ্টন সিনক্লেয়ারের “দি জাঙ্গল” এবং জ্যাক লন্ডন্সের “দি আয়রন হিল” বই দুটিতে। শ্রমঘন্টা হ্রাসের আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৮৬০-এর দশকে যার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ১৮৮৬ সালে হলেও আজ ও চলছে আমাদের সংগ্রাম। “ফেডারেশন অব অরগানাইজড ট্রেডস এন্ড লেবার ইউনিয়ন” শিকাগো জাতীয় সম্মেলন ১৮৮৪-এ সর্বপ্রথম ১লা মে, ১৮৮৬ সাল বা এর পর থেকে ৮ ঘন্টা কাজ করার আইন পাশের দাবি জানায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে, যে কোন মুল্যে এমনকি শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও ৮ ঘন্টা কাজ করার অধিকার আদায়ের জন্য শিকাগো শহরের হে মার্কেটের সামনে সমবেত হয় লাখো শ্রমিক।একই দিনে, এই দাবির সমর্থনে আমেরিকাতে প্রায় তিন লাখের বেশি শ্রমিক কর্ম বিরতি দেয়। শ্রমিকদের প্রতিরোধ করতে সরকার ও ব্যবসায়ীরা ভয়ে শ্রমিকদের পুলিশ দিয়ে ঘিরে ফেলে। পুলিশ শ্রমিকদের গুলি করার সুযোগ তৈরি করতে নিজেদেরই কাউকে দিয়ে পুলিশের উপর বোমা নিক্ষেপ করে এবং তৎক্ষনাত শ্রমিকদের উপর গুলি বর্ষণ করে। যাতে একজন পুলিশ সদস্যসহ ৮-১০ শ্রমিক নিহত এবং অনেকেই আহত হয়। দাবি মেনে নিলেও নেতৃত্ত্বস্থানীয় আট জনকে নৈরাজ্যকারী আখ্যা দিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় যাদের মধ্যে আলবার্ট পারসন্স, অগাস্ট স্পাইস, জর্জ এঙ্গেল ও এডলফ ফিশারকে ১১ই নভেম্বর, ১৮৮৭ সালে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। হাসি মুখে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়ে ৮ ঘন্টা কাজ করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং আজকের এই দিনে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি সেই মহান বীরদেরকে।

**পুঁজিবাদ বিকাশের সময়কাল এবং আধুনিক দিনের দাসপ্রথাঃ**

কনুতিলা ও কুইবেক পুঁজিবাদ বিকাশের সময়কালকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

১৫০০-১৭৭০ এর দশক কে বণিক পুঁজিবাদ, ১৭৭০-১৮৬০ এর দশক কে শিল্প পুঁজিবাদ, ১৮৬০-১৯৩০ এর দশক কে যৌথ শিল্প পুঁজিবাদ, ১৯৩০-১৯৭০ এর দশক কে কেইন্সিয়ান/ যৌথ পুঁজিবাদ এবং ১৯৭০- বর্তমান পর্যন্ত সময়কে নব্য উদার পুঁজিবাদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পুঁজিবাদের বিকাশের সময়কাল থেকে আমরা দেখতে পাই যে, শিল্প পুঁজিবাদের বিকাশের সময় থেকে কর্ম ঘন্টা হ্রাসের বা শ্রম আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে যার বিস্ফোরণ ঘটে যৌথ শিল্প পুঁজিবাদের সময়কালে।সেই সাথে পুঁজিবাদও টিকে থাকার ফন্দি আঁটতে শুরু করে এবং কল্যাণমুলক ও উদার মুক্ত বাজার অর্থনীতির তকমা নিয়ে নব্য উদার পুঁজিবাদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মুক্ত বাণিজ্য, খোলা বাজার, বেসরকারিকরণ, বানিজ্যিকীকরণ ও পণ্যসামগ্রীকরণের মাধ্যমে দুর্বিষহ করে তুলেছে শ্রমিকের জীবন ব্যবস্থা এবং প্রতিনিয়ত শোষণ করছে শুধু কারখানার শ্রমিক নয় চিন্তার শ্রমিক, কৃষক, নারী, শিশু, বেসরকারি কর্মচারি, ডাক্তার, প্রকৌশলী, শিক্ষক ও অনেককে। যেমন- ব্যক্তি ও যৌথ মালিকানাধীন স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যারা বিদ্যা দানের মহান প্রয়াস নিয়ে চুক্তি ভিত্তিক, সংযুক্তি, তদর্থক এবং কি হাজার হাজার টাকা জামানত দিয়ে যোগদান করেন। নিয়মের ফাঁদে প্রতিনিয়ত পেশামুলক সুবিধা এমনকি ন্যায্য মজুরি থেকেও বঞ্চিত তারা। স্থায়ী পদে কাজ করেও অনেকে জীবন যাপনের নূন্যতম চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হচ্ছেন যদিও প্রতিষ্ঠানগুলো উনাদের দিয়েই কামিয়ে নিচ্ছে কোটি কোটি টাকা। আবার এনজিও গুলো যারা দারিদ্রতা দূরীকরণ, মৌলিক অধিকার, মানবিক অধিকার এবং লিঙ্গ সমতার বুলি আওরায় তারাও প্রকল্পভিত্তিক ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে বঞ্চনা ও শোষণ করে কারণ তারাও নব্য উদার পুঁজিবাদীদের দালাল বা তল্পিবাহক। আবার আমরা যখন পুঁজিবাদী হওয়ার বাসনা নিয়ে যৌথ প্রতিষ্ঠান যেমন বাণিজ্যিক ব্যাংকে যোগদানের ক্ষেত্রে-লিখিত দলিলে বা দাসত্ব বন্ধনে নূন্যতম দুবছর চাকরি করার নিশ্চয়তা অন্যথায় তিন-পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা দেওয়ার অঙ্গিকারনামায় স্বাক্ষর করতে হয়। আমারা যারা ডিগ্রিধারী শ্রমিক তাদেরই যদি এমন বঞ্চনার শিকার হতে হয় তাহলে ডিগ্রি ছাড়া, কম শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত শ্রমিকদের অবস্থা কেমন একবার চিন্তা করুন। সেইসাথে অনানুষ্ঠানিক শ্রমিক, জোরপূর্বক শ্রমিক, শিশু শ্রমিক, বাণিজ্যিক যৌনকর্মী এবং অন্যান্যরা তো আছেই।

বিভিন্ন পরিসংখ্যানে এই চিত্রগুলো স্পষ্ট। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ২০১২ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে জোরপূর্বক নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় একুশ (২১) মিলিয়ন-যার ছাপ্পান্ন(৫৬) শতাংশ এশিয়া প্যাসিফিক এবং আঠার (১৮) শতাংশ আফ্রিকার অঞ্চলে। এই শ্রমিকদের নব্বই (৯০) শতাংশই কর্মরত আছে ব্যক্তিমালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যাদের ছাপ্পান্ন (৫৬)শতাংশই আবার মেয়ে ও নারী। ফলে দুনিয়াজুরে দারিদ্রতার হার বৃদ্ধি এবং মানুষের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে খোদ বিশ্ব ব্যাংকের ২০০৫ সালের প্রতিবেদন অনু্যায়ী। যেখানে সাব-সাহারা আফ্রিকার ৫০.৯ শতাংশ, দক্ষিণ এশিয়ার ৪০.৩ শতাংশ এবং পূর্ব ও প্যাসিফিক এশিয়ার ১৬.৮ শতাংশ মানুষের দৈনিক মাথাপিছু ক্রয় ক্ষমতা ১.২৫ ডলার।

শ্রম শক্তি জরিপ ২০১০ অনুযায়ী বর্তমান বাংলাদেশে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা প্রায় ৫৭ মিলিয়ন যাদের মধ্যে মাত্র ৫৪ মিলিয়ন মানুষ কোন না কোন কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট আছেন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ২০০৬ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী শুধুমাত্র বাংলাদেশে ৫-১৪ বছরের শিশু শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১২.৮ মিলিয়ন- ইতমধ্যে আর কতটাই হ্রাস পেয়েছে। ২০০৯-১০ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো গরীব শ্রমজীবীদের মজুরি হারের উপর জরিপ চালায় যেখানে ৩৬ টি ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় ২৫ টি অনানুষ্ঠানিক পেশাসহ ১৫৮ টি পেশার ধরনের উল্লেখ পাওয়া যায়। নামমাত্র ও প্রকৃত মজুরির ভিত্তিতে খোদ গরীব শ্রমজীবীদের মজুরির হারের মধ্যে বিস্তর ফারাক দেখা যায় যেখানে- নারীরা পুরুষের চেয়ে কম মজুরি পায়, গ্রামের শ্রমিকরা শহরের শ্রমিকদের চেয়ে কম মজুরি পায় এবং অনানুষ্ঠানিক কাজে নিয়োজিত শ্রমিকরা আনুষ্ঠানিভাবে নিয়োজিতদের চেয়ে কম মজুরি পায়। আর এই মজুরি বৈষম্য বাড়ছে ০.১৬ হারে। এছাড়াও অনিরাপদ এবং অসাস্থ্যকর কর্মপরিবেশতো আছেই যার প্রমাণ- রানা প্লাজা দুর্ঘটনা, তাজরিনে অগ্নিকান্ড ইত্যাদি। আমার একজন অনুজ আজকে ক্ষোভ করে বলেছেন যে, এদেশে একটি কোরবানীর গরুর দাম লাখ টাকার বেশি যা একজন শ্রমিকের জীবনের চেয়ে বেশি কারণ শ্রমিক মারা গেলে ২০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণও সময়মতো মিলে না। যাকে এক কথায় আধুনিক সময়ের দাসপ্রথা বলা যায়। আজকের এই মে দিবসে আধুনিক সময়ের দাসপ্রথার বিলোপ করাই হোক আমাদের মানবিক সংগ্রামের পহেলা পদক্ষেপ।

**মানবিক দুনিয়া বানানোর ভানঃ বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত**

মৌলিক অধিকার, মানবিক অধিকার ও শ্রম অধিকারে সংগ্রাম ১৮৮৬ সালের মে দিবসেই সীমাবব্ধ নেই। মেহনতি মানুষের সংগ্রাম চলছে এবং চলবে আমৃত্যু যা ইতোমধ্যেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে কয়েকবার নাড়া দিয়েছে। তাইতো পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কিছুটা হলেও শ্রমিকদের প্রতি বিভিন্ন ভাবে মানবিক হওয়ার ভান করে। তাই ১৯১৯ সালে ভারসেইল্স চুক্তির আওতায় শ্রমকল্যাণের নাম করে তৈরী করা হয় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা যা মুলত বিশ্ব মোড়লদেরই তাবেদারি করে ।

কেইন্সের কল্যাণমুলক অথবা রাশিয়ার মত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রভাবে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার(বর্তমান বাংলাদেশ) ১৯৬০ সালে দেশের শিল্পাঞ্চলগুলোতে ৩০ টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলো যার অধিকাংশই আজ অকার্যকার। যদিও বিভিন্ন ধরনের শ্রমিকের প্রাথমিক চিকিৎসা, শিক্ষা, চিত্ত বিনোদন ও অধিকার নিশ্চত করার প্রত্যয় নিয়ে এগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে প্রত্যেক শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের ১১ জন কর্মচারী ছাড়া আপনি-আমিতো দুরের কথা শ্রমিকরাও এগুলো সম্পর্কে জানে না। আমি ২০১৩ সালে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রগুলোর উপর গবেষণা চালিয়ে দেখেছি যে-১৫ টির বেশি কেন্দ্রে কোন মেডিকেল অফিসারই নেই; কেবল ২৬ শতাংশ শ্রমিক মাঝে মাঝে কেন্দ্রে সেবা নিতে আসে যাদের মাত্র ৪.৫ শতাংশ সুবিধাভোগী সম্পুর্ণ একমত যে, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র শ্রমিকের কল্যাণের জন্য সঠিকভাবে কাজ করে। বাংলাদেশ সরকার ২০০৬ সালে শ্রমিকের ৮ ঘন্টা কাজ, নূন্যতম, অতিরিক্ত ও রাত্রিকালীন কাজের জন্য মজুরির বিধান, পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য, শ্রমকল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা এবং শ্রম আইন বাস্তবায়নের উপর জোর দিয়ে আইন পাশ করে যা ২০০৯ সালে আবার সংশোধন করা হয়। বর্তমান বাংলাদেশ সরকারও শ্রমনীতি ২০১২ এবং গার্মেণ্টস শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরি ৫ হাজার টাকা করার বিধান প্রদান করে। এসব আইনের অধিকাংশরই সঠিক বাস্তবায়ন নেই। তাই বলা যায়, এর সবই কেবল মানবিক হওয়ার ভান। কারণ শ্রম আইন বা নীত বাস্তবায়ন হলে বিদেশি ক্রেতাদের বেশি দাম দিয়ে আমাদের থেকে পোশাক বা বিভিন্ন পণ্য কিনতে হবে যাতে তাদের কোন আগ্রহ নেই। আবার আমেরিকাতেই মে দিবস উদযাপন বন্ধ এবং এর ইতিহাস মুছে ফেলার জন্য ১লা মে কে “আইন ও শৃংখলা দিবস” হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যদিও দুনিয়ার ৭০ টিরও অধিক দেশে জাতীয়ভাবে মে দিবস পালন করা হয়।

তারপরও তামাম দুনিয়ার মেহনতি মানুষ বা চিন্তার শ্রমিক হিসেবে স্বপ্ন দেখি ভান নয় বাস্তবায়ন হোক মৌলিক, মানবিক ও শ্রমিক অধিকারের (যে কোন নামেই)। আজকের মে দিবসে, সকল শ্রমিকভাইদের আহ্বান জানাই মানবিক সংগ্রামের আবাদ চালিয়ে যাওয়ার।

সবশেষে, শিকাগো শহরের হে মার্কেটের স্মৃতিসৌধের গায়ে লিখিত উক্তিটি উচ্চারণ করে আজকের মে দিবসে মানবিক সংগ্রামের লাল সালাম জানাই সকল ধরনের শ্রমিকদের।

“এমন এক দিন আসবে যেদিন আমাদের (শ্রমিকের) কন্ঠের চেয়ে মৌনতাই অধিক শক্তিশালী হবে যদিও আজ তোমরা (পুঁজিবাদীরা)টুঁটি চেপে আমাদের কন্ঠরোধ করছো”